এই পথ চলা

শুজা রশীদ

১৫ - ভ্রমণে বিভ্রম

এলগনকুইন পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম এক শরতে। ওন্টারিওর শারদীয় পাতার বাহারী রঙের খেলা দেখতে হলে টরন্টো শহর ছেড়ে খুব বেশী দূর যাবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু কেউ যদি অসাধারণ, বিস্ময়ে হতবাক হবার মত সৌন্দর্য দেখতে চায় তাহলে শহর ছেড়ে কিছু দূর গেলে, বিশেষ করে এলগনকুইন পার্কের দিকে গেলে সেই বাসনা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে। আমরা আট দশটি পরিবার যারা গ্রেটার টরন্টো এরিয়াতে বসবাস করি, তারা সময় এবং সুযোগ হলে অন্তত প্রতি শরতে রঙের খেলা দেখবার জন্য কাছে হোক আর দূরে হোক দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ি। দুই তিন দিনের জন্য হলেও এই ভ্রমণ আমাদের সবার জীবনেই প্রশান্তি এবং বৈচিত্রতা বয়ে আনে। কিন্তু ভ্রমণ যে সব সময় একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে মেটে না তা তো বলাই বাহুল্য। আমাদেরও নানা সময়ে নানান ঝুট ঝামেলা হয়েছে। আজ যে বিভ্রাটের কথা বলব সেটা বিশেষ করে স্মরণ আছে তার নাজুকতার কারণে। ভণিতা বাদ দিয়ে সারবস্তুতে যাওয়া যাক। এলগনকুইন পার্কের পুরোটাই ঘন জঙ্গল এবং পাহাড়ে ঘেরা। এক পাশ দিয়ে একটা চিকন নদীর মত বয়ে গেছে হাইওয়ে ৬০। পার্কের ভেতরে ক্যাম্পিং করা যায় কিন্তু কোন হোটেল, মোটেল নেই। আমরা পার্কের নিকটেই অবস্থিত বিখ্যাত টুরিস্ট টাউন হান্টসভিলে একটা মোটেলের মোট দশটা কামরা ভাড়া নিলাম। শরতে এখানে প্রচন্ড ভীড় হয়। সারা দেশ থেকে মানুষ আসে। আমরা যে মোটেলে উঠলাম সেটা একটা টিলার শরীর কেটে তৈরী। তিন তলা কাঠের মোটেল। করিডোর জাতীয় কিছু নেই। একেবারেই খোলামেলা। উপরে নীচে মিলিয়ে আমাদের সবার থাকার জায়গা হল।

টরন্টো থেকে তিন চার ঘন্টার রাস্তা। ভীড় ভাট্টা কেমন হবে কারো ধারণা ছিল না। এক ভাবী বাসা থেকে বিরিয়ানী এবং অন্য আরেক ভাই বিভিন্ন

ধরণের কাবাব রান্না করে সঙ্গে নিয়ে চললেন। সেখানে গিয়ে সবাই মিলে বাসার রান্না মজা করে খাওয়া যাবে। টরন্টো থেকে যারা আশে পাশে বেড়াতে যান তারা অনেকেই এটা করে থাকেন। সাধারণত তেমন কোন সমস্যা হয় না। অক্টোবর মাসে মোটামুটি ঠান্ডাই পড়ে যায়। গাড়ীতে কয়েক ঘন্টায় খাবার নষ্ট হয়ে যাবার কথা নয়।

কিন্তু এই যাত্রায় আমরা পথে বেশ কিছু জায়গায় থামতে থামতে গেলাম। চমৎকার, দর্শনীয় সব স্থান – বিশেষ করে ব্রেসব্রিজের হাই ফলস পার্কে গিয়ে জলপ্রপাত না দেখে চলে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। সব দেখে টেখে যখন হান্টসভিলে পৌছালাম তখন বিকেল। গাড়ীর মধ্যে খাবার পাঁচ ছয় ঘন্টা ঝিম মেরে বসে আছে। কোনরকমে রুমে উঠেই সেগুলো বের করে খাওয়ার উদ্যোগ নেয়া হল। পাশাপাশি তিনটি রুমে আমরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়লাম। মেঝেতে, বিছানায়, বারান্দায় – বড় ছোট মিলিয়ে আমরা প্রায় পয়ত্রিশ জন। বেশ একটা পিকনিক – পিকনিক ভাব। শহরটা পাহাড়ী এলাকায় স্থাপিত। চারদিকের দৃশ্য খুবই মনরম। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় দেখা যাচ্ছে লায়ন্স লুকআউট পয়েন্ট। হান্টসভিলের সবচেয়ে বিখ্যাত টুরিস্ট স্পট। ওখানে না গেলে এতদূর আসাই বৃথা। ঠিক হয়েছে খাবারের পর্ব চুকলেই আমরা সেখানে গিয়ে হাজিরা দেব।

সবারই মনে মনে একটু দুশ্চিন্তা ছিল খাবারের অবস্থা নিয়ে। সেদিন আবহাওয়া একটু গরমের দিকেই ছিল। খেতে গিয়ে অবশ্য তেমন কোন কিছু নজরে পড়ল না। মাইক্রোওয়েভ ছিল রুমে রুমে। ভালো করে গরম করে সুস্বাদু খাবার সবাই মিলে সপাসপ সাটা হল।

সন্ধ্যা হবার আগেই সবাই মিলে বেড়াতে গেলাম লায়ন্স লুক আউটে। শহরের সবচেয়ে উঁচু পয়েন্ট। এখান থেকে সারা হান্টসভিল শহরটা এবং চারদিকের বনানীর নয়ানভিরাম সৌন্দর্য যে কাউকে মুগ্ধ করবে। গাড়ি রাখার জায়গা কম হলেও কোন একভাবে ম্যানেজ হয়ে গেল।

ঐদিন আমরা আর দূরে কোথাও গেলাম না। শহরের ভেতরেই ঘোরাঘুরি করলাম। বড় বড় বাসে করে প্রচুর চৈনিক টুরিস্টরা এসেছে। তাদের কোন একটা সম্মেলন আছে। সারা শহর গমগম করছে মানুষে। আমরা দল বেঁধে হাঁটাহাঁটি করলাম। রাতের বাতাসে সামান্য হিমের আমেজ থাকলেও তা আমাদের মত শীতপ্রধান দেশের মানুষদেরকে কাবু করার জন্য যথেষ্ট নয়। টরন্টোতে আজকাল শীত কম পড়লেও যখন পড়ে তখন একেবারে হাঁড়মাস জমিয়ে দিয়ে যায়। মাইনাস ত্রিশ, চল্লিশ অস্বাভাবিক নয়।

বিকালের দিকে পেট পুরে খাওয়ায় রাতে কারোরই তেমন ক্ষুধা ছিল না। আমরা পুরুষেরা মোটেলে খুব হাঁক ডাক করে তাস পিটালাম অনেক রাত পর্যন্ত, মহিলারা এবং বাচ্চারাও খুব হৈ চৈ করে আড্ডা দিল। মোটেল ভর্তি মানুষ থাকলেও কোন নালিশ এলো না। বেশী হৈ চৈ করার জন্য আমরা এর আগে দু' একবার বিস্তর অপমানিত হয়েছি কিন্তু কয়লা ধুলে না যায় ময়লা।

যাই হোক, পরদিন নাস্তা সেরে আমরা এলগনকুইন পার্কের দিকে রওনা দিলাম। আমাদের প্রথম গন্তব্য পার্কের ভিসিটর সেন্টার। হাইওয়ে ৬০ নিয়ে পার্কের ভেতরে ঢুকলে কিলোমিটার ৪৩ মার্কে অবস্থিত সেন্টারটা। টিলার উপরে অনেক খানি জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে। চারদিকে বড় বড় কালো পাথরের চাঙড়। বিশাল এক ক্যাফেটারিয়া আছে ভেতরে। পেছন দিকে গেলে নীচের উপত্যকার অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য নজরে পড়ে। সেখানে প্রচন্ড ভীড় পেলাম আমরা। হাঁটাহাঁটি করতেও সমস্যা। অল্প কিছুক্ষণ কাটিয়ে রওনা দিলাম পরবর্তি গন্তব্যে – লুকাউট ট্রেইল।
পার্কের মধ্যে অনেক ট্রেইল আছে। কয়েকটা বিশেষভাবে পরিচিত এবং ব্যবহৃত। লুক আউট ট্রেইল তার মধ্যে একটা। রাস্তার পাশে গাড়ী রেখে আমরা সবাই দল বেঁধে প্রশস্ত ট্রেইল ধরে পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলাম। দুই দিকেই ঘন জঙ্গল। ট্রেইল বেশ খাড়া হয়ে উঠে গেছে চুড়ার দিকে। প্রায় এক কিলোমিটারে মত গেলে পড়বে লুকাউট পয়েন্ট। সেখান থেকে নাকি খুব সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়, বিশেষ করে শারদীয় রঙের বাহার। প্রায় ২ কিলোমিটারের লুপ, হাঁটুতে ব্যাথা বেদনা থাকলে উপরে ওঠার সময় কিঞ্চিৎ সমস্যা হতে পারে কিন্তু এমন কোন কঠিন ট্রেইল নয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ট্রেইল নিয়ে নয়। আগের দিনের বিরিয়ানী এবং কাবাবের স্তুপ পেটের মধ্যে ঘন্টা বারো ধরে ঘাটাঘাটি করে কি তেলেসমাতি কান্ড করেছে কে বলতে পারে কিন্তু খুব শিঘ্রীই তার ফলাফল দেখা দিল। প্রথম আক্রমণ গেল দলের বেশ কয়েকজন শিশুর উপর দিয়ে। তাদের মায়েদেরকে দেখা গেল যে যার সন্তানদেরকে নিয়ে দ্রুত জঙ্গলের দিকে রওনা দিচ্ছেন। ঘটনা কি জানতে চাওয়ায় রহস্য উদ্ঘাটন হল। সবারই পেট ছুটে গেছে। এই ট্রেইলের ধারে কাছে কোন বাথরুম জাতীয় বস্তু নেই, সুতরাং জঙ্গলই ভরসা। আমি হাসি আটকাতে পারলাম না। মায়েদের উৎকণ্ঠিত মুখ আর চোরা চাহনি দেখে মনের মধ্যে হাসির যে স্রোত কুলকুলিয়ে উঠল তাকে অবদমন করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। সেই জন্য অবশ্য লতার ভ্রূকুটি

এবং গাল মন্দ দুটোই খেতে হল। জানা গেল আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। মানুষের দুঃখ কষ্ট আমাকে আদৌ বিব্রত করে না। আমি মোটামুটিভাবে একজন অমানুষ। ইত্যাদি ইত্যাদি। আরেকটু এগিয়ে যেতে দেখলাম দলের পুরুষদের মধ্যেও একজন উধাও হয়ে গেছেন। কৌতূহলী হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে জানা গেল তারও কিঞ্চিৎ সমস্যা দেখা দেয়ায় তিনি মা বনানীর কোলে একটু নির্জনতার খোঁজে গেছেন। বন্ধু ভদ্রলোক ফিরলেন প্রায় বিশ মিনিট পর। তার মুখে শুষ্ক হাসি। "ভাই, একেবারে যাচ্ছে তাই অবস্থা। বন বাদাড়ে কি মনের সুখে হাগা হাগি করা যায়? শুধু ভয় হচ্ছিল কোন জীব জন্তু এসে কামড়ে টামড়ে না দেয়।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "মোছামুছির কাজ কিভাবে সারলেন?"

তিনি অগ্নি দৃষ্টি আমাকে ভস্ম করলেন। "খুব ফুর্তিতে আছেন? আমার এদিকে এস্পার ওস্পার অবস্থা। পাতা ফাতা দিয়ে কোনরকমে ব্যবস্থা করতে হল।"

ঘাম টাম ছুটিয়ে শেষ পর্যন্ত লুকাউট পয়েন্টে যখন পৌঁছালাম আমরা ততক্ষণে অনেকখানি সময় কেটে গেছে। কিন্তু উপরে ওঠাটা সম্পূর্ন স্বার্থক। নীচের উপত্যকা থেকে কম করে হলেও কয়েক শ' ফুট উঁচুতে অবস্থিত লুক আউট পয়েন্ট থেকে চারদিকের যে দিগন্ত ব্যাপি দৃশ্য নজরে পড়ে তা বাস্তবিকই মনে রাখার মত। একটাই ভয়ের ব্যাপার, সেখানে কোন রেলিং জাতীয় কিছু নেই। একটু অসাবধান হয়ে পিছলে নীচে পড়ে যাওয়াটা একেবারে অসম্ভব মনে হল না। যদিও এখানে কেউ কখন পড়েছে কিনা জানি না। কিন্তু ট্রেইল থেকে পড়ে গিয়ে জীবন হারানোটা একেবারে বিরল ব্যাপার নয়।

ফিরবার পথে অশনি সংকেত দেখা দিল। মোটেলের দিকে ফিরছি। ভিসিটর সেন্টার পেরিয়ে বোধহয় আট দশ কিলোমিটারও যেতে পারি নি হঠাৎ পেটের মধ্যে আষাঢ়ের মেঘের মত গুরু গুরু করে বিশাল গর্জন শুরু হল, সেই সাথে ভয়াবহ শব্দে অসম্ভব দুর্গন্ধময় বায়ু ছাড়তে শুরু করলাম। ছেলেমেয়েরা এবং লতা নাক চেপে ধরে ওয়াক ওয়াক করতে শুরু করল। আমার ধারণা ছিল আমার পেট অনেক শক্ত এবং এই জাতীয় সামান্য ব্যাপার আমাকে কখন ঘায়েল করতে পারবে না। কিন্তু এবার বুঝলাম ব্যাক্টেরিয়া কাউকেই ছাড়ে না। তলপেটে এমন ভয়াবহ চাপের সৃষ্টি হল যে সেইভাবে

মোটেল পর্যন্ত যেতে পারবো সেই ভরসা হল না। গাড়ী ঘুরিয়ে রওনা দিলাম ভিসিটর সেন্টারের দিকে। সেখানে বাথরুমের সামনে অনেক লম্বা লাইন দেখেছিলাম, কিন্তু এই অবস্থাতে সেটাই শেষ ভরসা। যদি লাইনে পড়ে যাই তাহলে কি করব জানি না। সেখানে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। আশেপাশে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকে কাজ সারা যাবে সেই আশা নেই। বেইজ্জতীর একশেষ হবে। আমার কাঁতর অবস্থা দেখে লতার হাসি আর ধরছে না। আমি কটমট করে তাকিয়ে তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করছি। কাজ হচ্ছে না। গাড়ীর মধ্যে একটা সর্বনাশ হলে তখন হাসি কোথায় ছুটে যাবে! ভিসিটর সেন্টারে গাড়ী থামিয়েই পড়ি মড়ি করে ছুটলাম। ভাগ্য ভালো, সেই সুক্ষনে বাথরুমের লাইন হঠাৎ করেই হালকা হয়ে গেছে। জনা দুয়েক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিল, তাদেরকে এক রকম ঠেলা দিয়ে সরিয়ে 'সরি সরি, বেরিয়ে যাচ্ছে, আল্লার কসম' ইত্যাদি বলতে বলতে বাথরুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম। পেছনে আপত্তিকর কিছু মন্তব্য শোনা গেল। বলুক। শরীরে বিদ্যুতের গতি এলো। ওম শান্তি!

সেই রাতে মোটেলে ফিরে জানা গেল অধিকাংশেরই অল্প বিস্তর পেট ছুটে গেছে। যে দুই তিনজন এই যাত্রা রক্ষা পেয়েছে তার মধ্যে লতা একজন। সে আমাদেরকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করল। করুক। সে বুঝে শুনে খায়। আগের দিন বিরিয়ানী কিংবা কাবাব, কোনটাই খায় নি। তক্কে তক্কে থাকলে তাকেও নিশ্চয় একদিন নাজুক অবস্থায় ধরা যাবে।

আমরা আরোও একদিন হান্টসভিলে ছিলাম। প্রায় সবারই পেট সংক্রান্ত কম বেশী সমস্যা হলেও চুপচাপ মোটেলে বসে থাকা সম্ভব হয় নি। দল বেঁধে গিয়েছিলাম ডরসেট লুকআউট টাওয়ার দেখতে। এক শ' ফুট উঁচু টাওয়ারে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে উপরে ওঠা যায়। টাওয়ারটা স্থানীয় লেকের লেভেল থেকে প্রায় সাড়ে চারশ' ফুট উঁচুতে অবস্থিত এবং উপর থেকে চারদিকের দিগন্তব্যাপি দৃশ্য মনমুগ্ধকর। আমার অসম্ভব উচ্চতা ভীতি। উঁচু কিছু দেখলে আমি কোন একটা অজুহাত তুলে সটকে পড়ি। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হেসে খেলে টপাটপ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে আর নামছে দেখে খুব অহমিকায় লাগল। বার তিনেক চেষ্টায় ভীতিকে জয় করে অবশেষে শীর্ষে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। মহিলাদের টিটকারীতে টেকা দায় হলেও মনে মনে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত বোধ করেছি। ভয় যত অমূলকই হোক তাকে জয় করার মধ্যে চরম আনন্দ রয়েছে।

এরপরও আমরা শারদীয় ভ্রমণে গেছি ওন্টারিওর বিভিন্ন স্থানে কিন্তু রান্না বান্না করে নিয়ে যাওয়াটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে।